সংজ্ঞা, বিমান চিত্রের ও উপগ্রহ প্রতিচ্ছবির মৌলিক নীতি ও বৈশিষ্ট্য

(Definition, basic principles and characteristics of aerial photo and satellite imageries)

বিমান চিত্র (Aerial Photo)

ভূমিকা : মানচিত্র অঙ্কন বিদ্যায় ক্রমবর্ধমান গুরুত্বলাভ কারী উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর তথ্য সংগ্রহ ও দৈশিক বর্ণনায় সাহায্যকারী ব্যবস্থা হিসাবে বিমানচিত্র তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্যায়নে ● দেশ বা অঞ্চলের ক্ষেত্রে বিমান চিত্র তাৎপর্য বহন করে। ভারতে ১৯৭২ সালের পর থেকে এই আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর মানচিত্র অঙ্কন, তথ্য তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা উন্নতিলাভ করে। ভৌগোলিক, ভূ-তত্ত্ববিদ্, মৃত্তিকা বিজ্ঞানী, পরিকল্পনাবিদ্ প্রমুখের কাছে এই বিমান চিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

বিমান চিত্রের সংজ্ঞা (Definition of Aerial Photo) : দূর সংবেদন পদ্ধতিতে উড্ডীয়মান বিমানে উন্নতমানের ক্যামেরা প্রতিস্থাপন করে ভূ ভাগের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য যে চিত্র বা প্রতিচ্ছবি গ্রহণ করা হয় তাকে বিমান চিত্র বলে। বিমান ছাড়াও বেলুন, ড্রোন প্রভৃতি থেকেও এই চিত্র তোলা হয়।

বিমান চিত্রের সাথে টোপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্রের তুলনা (Comparative study between Aerial Photo and Topographical Map):

১) বিমান চিত্র দৃশ্যানুগ বা কেন্দ্রীয় অভিক্ষেপ প্রকৃতির।

অন্যদিকে ভূ-বিবরণী মানচিত্র ওরগোনাল অভিক্ষেপ প্রকৃতির।

২) ভূ প্রকৃতি ও তার উচ্চতা, ঢাল প্রভৃতির পার্থক্যের কারনে বিমান চিত্রের মাপনী বা স্কেল সব স্থানে এক থাকে না কিন্তু ভূ-বিবরনী মানচিত্রের দ্বারা একটি অঞ্চলের মানচিত্র একই মাপনীতে প্রস্তুত করা হয়।

৩) বিমান চিত্রের দ্বারা ভূমিভাগের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। কিন্তু ভূ-বিবরনী মানচিত্রে কতকগুলি প্রচলিত চিহ্ন সংকেতের সাহায্যে কিছু কিছু ভূ-দৃশ্য তুলে ধরা হয়।

৪) বিমান চিত্র একটি নির্ভরযোগ্য ও অপ্রভাবিত তথ্য সম্ভার। যার গুনমান ক্যামেরা, ফিল্ম, আলো, বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থা, লেন্স, ক্যামেরা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। কিন্তু ভূ-বিবরনী মানচিত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য সীমিত এবং মানুষের দ্বারা প্রস্তুত করা হয় বলে, বিমান চিত্রের ন্যায় নির্ভরযোগ্য নয়।

৫) বিমান চিত্র পরিমার্জন করা যায় না। কিন্তু ভূ-বিবরনী মানচিত্র পরিমার্জন করা যায়।

৬) বিমান চিত্রে উচ্চতা ও স্থানের দেখানো যায় না। কিন্তু ভূ-বিবরনী মানচিত্রে তা দেখানো সম্ভব।

৭) তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিমান চিত্র ভূ-বিবরনী মানচিত্রের তুলনায় দ্রুততার সাথে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

৮) বিমান চিত্র প্রস্তুতের সময় জরীপ কৃত ভূমিভাগ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ভূবিবরনী মানচিত্রের ক্ষেত্রের ভূমিভাগ জরীপের মাধ্যমে তথ্য সমাকেশ করা হয়।

৯) বিমান চিত্র ত্রি মাত্রিক দৃশ্যানুভূতি প্রদান করে। কিন্তু ভূ-বিবরনী মানচিত্রে তা পাওয়া যায় না।

বিমান চিত্রের সুবিধা ও অসুবিধা (Advantage and disadvantage of Aerial Photo) :

অন্য যে কোনো মানচিত্রের থেকে বিমান চিত্র নিম্নরূপ সুবিধা প্রদান করে থাকে। যথা -

১) এই চিত্রের সাহায্যে একটি অঞ্চলের সাম্প্রতিক ও নিখুঁত প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। অন্যভাবে বলা যায়, বিমানচিত্র ও ভূমিভাগ এক।

২) বিমান চিত্র খুব সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে, এমনকি কয়েক ঘন্টার মধ্যে বিশেষজ্ঞের যেকোনা ব্যবহৃত হতে পারে।

৩) যে সব অঞ্চলের ভূমিভাগ দুর্গম এবং জলবায়ুগত বিচারে প্রতিকূল সেই সব অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহে বিমান চিত্র দ্রুততার সাথে সাহায্য করে। যে কারনে মিলিটারি মানদের বা সেনাবাহিনী লোকজনদের কাছে বিমান চিত্র খুবই অত্যাবশ্যকীয়। কারন কেবলমাত্র এই চিত্রে মিলিটারি কাঠামো (যেমন, বাঙ্কার, ক্যাম্প, ব্যারাক প্রভৃতি) চিহ্নিত করা যায়।

৪) এই মানচিত্র যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের নিত্যদিনের তথ্য প্রদান করে তাই গবেষক, পরিকল্পনাবিদ, প্রতিরক্ষার সাথে যুক্ত কর্তাব্যক্তিদের কাছে অতি প্রয়োজনীয়।

বিমান মানচিত্রের অসুবিধাগুলি হলো নিম্নরূপ —

১) স্টিরিওস্কোপ ব্যতিত এই মানচিত্র পাঠ করে তথ্য সংগ্রহ করা যায় না। এছাড়া, দক্ষ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন হয়।

২) এই মানচিত্রের কোনো স্থানের অবস্থান নির্দিষ্ট করা যায় না এবং মানচিত্রের মাপনী ও নির্ভুল নয়।

৩) ওভারল্যাপিং ছাড়া কোনো অঞ্চলের পূর্ণাঙ্গ ভূ-দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া যায় না এবং এর জন্য উন্নত স্টিরিওস্কোপ প্রয়োজন।

৪) এই মানচিত্র প্রস্তুতের জন্য উন্নত ক্যামেরা, বিমান ও বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পাইলট প্রয়োজন হয় বলে প্রাথমিক ব্যয় বেশি হয় এবং যে দেশে উন্নত প্রযুক্তির অভাব রয়েছে সেই দেশের পক্ষে এই মানচিত্র তৈরি করা সম্ভব নয়।

বিমান চিত্রের প্রকারভেদ (Taypes of Aerial Photo):

সাধারণভাবে বিমানে ক্যামেরা বসিয়ে যে চিত্র গ্রহণ করা হয় তাকে বিমান চিত্র বলে। ক্যামেরার কার্যপ্রণালী এবং ভূমিভাগের সাপেক্ষে বিমান উড়ানের ভিত্তিতে বিমানচিত্রকে নিম্নরূপ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা -

১) উলম্ব চিত্র (Vertical Aerial Photo) : ক্যামেরাকে ভূমিভাগের দিকে সোজাভাবে রেখে যে চিত্র তোলা হয় তাকে উলম্ব চিত্র বলে। এই চিত্রের ক্ষেত্রে প্লাম্বরেখা ক্যামেরার অক্ষের সাথে সমকোণে অবস্থান করে। তবে ৩° পর্যন্ত কম-বেশি কৌনিক মানযুক্ত চিত্রকেও উলম্ব চিত্রের অর্ন্তভূক্ত করা হয়।

এই চিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি হলো -

ক) ক্যামেরার লেন্সের অক্ষ ভূমিভাগের সাথে লম্বভাবে অবস্থান করে।

খ) এই চিত্রের দ্বারা তুলনামূলক ভাবে কম ক্ষেত্রফলের ভূমিভাগের চিত্র তোলা হয়।

গ) এই চিত্র দ্বারা তোলা ভূমিভাগ বর্গাকার বা আয়তাকারহয়।

ঘ) এই চিত্রের দ্বারা ভূ-দৃশ্যের উপরিভাগ গুলি দেখা যায়। যেমন, বাড়ীর ছাদ, পাহাড়ের চূড়া প্রভৃতি।

ঙ) যদি সমতল ভূমিভাগের চিত্র তোলা হয় তাহলে তা সঠিক দিক ও মাপনী বজায় রাখে।

চ) এই চিত্রের দ্বারা ভূ-প্রকৃতি সহজে বোঝা যায় না।

২) অনুভূমিক চিত্র বা ভূমি সংলগ্ন বা পার্থিব চিত্র (Horizontal Aerial Photo): এই ধরনের চিত্র তোলার ক্ষেত্রে ক্যামেরা লেন্সের অক্ষ অনুভূমিক ভাবে রাখা হয়। এই ধরনের চিত্র খুব কমই ব্যবহার করা হয়।

৩) কম তীর্যক চিত্র (Low Oblique Aerial Photo): লম্ব অবস্থান থেকে ক্যামেরা লেন্সকে প্রায় ৩০° কোনে অবস্থানকরে যে বিমান চিত্র তোলা হয় তাকে কম তীর্যক বিমান চিত্র বলে। এই চিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি হলো -

ক) এই চিত্রের দ্বারা তুলনামূলক ভাবে কম ক্ষেত্রফলের ভূমিভাগের চিত্র তোলা হয়।

খ) এই চিত্র দ্বারা তোলা ভূমিভাগের আকৃতি ট্র্যাপিজিয়মের মতো হয়। কিন্তু চিত্র বর্গাকার বা আয়তাকার হয়।

গ) এর দ্বারা ভূ-দৃশ্যের প্রচলিত দৃশ্যানুভূতি পাওয়া যায়। অর্থাৎ কোনো লম্বা বস্তুর অবস্থান ও তার পার্শ্বচিত্র বোঝা যায়। চিত্রের লম্বা ভূ দৃশ্যের ছায়ারেখা দেখতে পাওয়া যায়।

ঘ) সমগ্র মানচিত্রর জন্য কোনো নির্দিষ্ট মাপনী ব্যবহার করা যায় না। ফলে দূরত্ব, দিক প্রভৃতি পরিমাপ করা সম্ভব হয় না।

ঙ) প্রকৃতির দৃশ্য অনুধাবন করা যায়, কিন্তু তার কিছুটা বিচ্যুতিও ঘটে।

চ) এই চিত্রে দিগন্তরেখা দেখা যায় না।

৪) অধিক তীর্যক বিমান চিত্র (High Oblique Aerial Photo): লম্ব অবস্থান থেকে ক্যামেরা লেন্সকে

প্রায় ৬০° কোনে অবস্থান করে যে বিমান চিত্র তোলা হয় তাকে অধিক তীর্যক বিমান চিত্র বলে। এই চিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি হলো -

ক) এই চিত্রের দ্বারা তুলনামূলক ভাবে অধিক বিস্তৃত ক্ষেত্রফলের ভূমিভাগের চিত্র তোলা হয়।

খ) এই চিত্র দ্বারা তোলা ভূমিভাগের আকৃতি ট্রাপিজিয়মের মতো হয়। কিন্তু চিত্র বর্গাকার বা আয়তাকার হয়।

গ) এই চিত্রে ভূ-দৃশ্যের দৃশ্যানুভূতি বিভিন্ন হয়।

গ) দিক ও দূরত্ব সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না।

ঘ) ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণালাভ করা যায় তবে কিছুটা বিচ্যুতি থাকে এবং অধিক উচ্চতার ভূমিভাগকে এই চিত্রে দেখানো যায় না।

৫) অভিসারী চিত্র (): অভিসারী চিত্রের ক্ষেত্রে তীর্যকভাবে বিমান চিত্র তোলা হয়। কিন্তু একটি ক্যামেরায় দুটি লেন্স বা একসাথে একটি লেন্স যুক্ত দুটি ক্যামেরা ব্যবহার করে চিত্র গ্রহন করা হয়। ক্যামেরা দুটি একসাথে উন্মুক্ত হয় এবং ক্যামেরা লেন্সের অক্ষ উড্ডয়ন রেখার সাথে সমান্তরাল থাকে। ক্যামেরাগুলি বিস্তৃত কোনের () হয়।

৬) ত্রিমাত্রা বিশিষ্ট বিমান চিত্র (): এই চিত্রের ক্ষেত্রে একসাথে একটি উলম্ব এবং দুটি অধিক তীর্যক বিমান চিত্র তোল হয়। এই চিত্রগুলি উড্ডয়ন রেখার সাথে সমকোনে তোলা হয়। তাই একে কম্পোজিট চিত্রও বলে। এর সাহায্যে সুবিস্তৃত অঞ্চলের চিত্র তোলা যায়। যে কারনে বিশেষ ধরনের ফিল্মও ব্যবহার করা হয়।

৭) প্যানোরমিক চিত্র (): এই চিত্রের ব্যবহার দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর দ্বারা অনেক নিখুঁত ভূ-দৃশ্য বোঝা যায়। এগুলি উন্নত প্রযুক্তির ও উচ্চমানের বিমান চিত্র। এই চিত্র গ্রহনে ব্যবহৃত ক্যামেরা স্ক্যানিং প্রকৃতির এবং বিমান উড়ানের দিক অনুযায়ী সরতে পারে, ফলে ভূ-প্রকৃতির পার্থক্য সহজে এই চিত্র থেকে অনুধাবন করা যায়।

বিমানচিত্র তোলার জন্য ব্যবহৃত ফিল্মের প্রকারভেদ ():

বিমান ফোটোগ্রাফি বা আলোকচিত্র-তে ব্যবহৃত ফিল্ম মূলতঃ চারপ্রকার। যথা - প্যানক্রোমেটিক (), অবলোহিত (), রঙীন (), ও ক্যামিউফ্লেজ ডিটেকশন ()।

ছোট ক্যামেরা ও গড় পড়তা আলোকচিত্র তৈরির জন্য প্যানক্রোমেটিক ফিল্ম ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের ফিল্মে বস্তু থেকে ধূসর বর্ণের () হালকা আলোক প্রতিফলন ধরা পড়ে এবং আলোকচিত্র সাদা-কালো প্রকৃতির হয়। বেশির ভাগ বিমান আলোকচিত্র এই ধরনের ফিল্ম ব্যবহার করে তৈরি করা হয়।

অবলোহিত ফিল্ম এক ধরনের সাদা-কালো ফিল্ম যা অবলোহিত তরঙ্গ রশ্মিকে গ্রহণ করে। ভূ-ভাগের কৃত্রিম অর্থাৎ মনুষ্য সৃষ্ট উপাদানগুলির চিত্র গ্রহনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

রঙীন ফিল্মও গড়-পড়তা ক্যামেরায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই ধরনের ফিল্মের ব্যবহার খুবই সীমিত কারন পরিষ্কার ও রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়ায় আলোকচিত্র গ্রহনের জন্য এই ফিল্ম বিশেষ উপযোগী। সাধারণতঃ ফিল্মের রঙ্গ নীল, সবুজ, লাল হয়ে থাকে।

ক্যামিউফ্লেজ ডিটেকশন হলো এক বিশেষ ধরনের ফিল্ম যা স্বাভাবিক উদ্ভিদের আলোকচিত্র গ্রহনের সময় ব্যবহার করা হয়। এতে বস্তুর প্রকৃত রঙ্গের পরিবর্তে আলোকচিত্রে অন্য রঙ্গ দেখা যায়। যেমন স্বাভাবিক উদ্ভিদের সবুজ রঙ্গ আলোকচিত্রে লালচে হয় এবং মনুষ্য সৃষ্ট বস্তু নীলাভ বা বেগুনি হয়। তাই এই ফিল্মকে ফলস্ কালার ফিল্ম বলে।

বিমান চিত্রে উল্লেখিত তথ্যাবলী (MAginal Information of Aerial Photo):

বিমানচিত্রের প্রান্তবর্তী অংশে উল্লেখিত তথ্যাবলীগুলি হলো -

১) উত্তর দিক নির্দেশকারী রেখা,

২) বিমান চিত্রের শিরোনাম ও উদ্দেশ্য,

৩) সময় ও তারিখ,

৪) ফোটো সহায়ক বিষয় — ফোটো নম্বর, মিশন নম্বর উড়ানের তারিখ,

৫) স্কেল।

৬) মানচিত্রের সহায়ক বিষয় () — শীট নাম, শীট নম্বর, গ্রিড বা স্ট্রিপ নম্বর।

৭) ফিডুসিয়াল চিহ্ন;

৮) ক্যামেরার ফোকাল দৈর্ঘ্য,

৯) উড্ডয়ন উচ্চতা,

১০) ক্যামেরার নাম, ইত্যাদি।

বিমানচিত্র সম্পর্কিত কিছু পরিভাষা (Termionology ralated to Aerial Photo)

১) ফোটোগ্রামেট্রি ( ): গ্রীক্ ফোটো শব্দের অর্থ আলো এবং গ্রামার-এর অর্থ যা লেখা হয় ও মেট্রোন-এর অর্থ পরিমাপ করা থেকে ফোটোগ্রামেট্রি শব্দের উদ্ভব। এটি একটি বিজ্ঞান বা কৃতকৌশল যার দ্বারা ফোটোগ্রাফের মাধ্যমে কোনো কিছুর সঠিক পরিমাপ গ্রহন করা যায়। যেমন স্কেল নির্ণয় করা, বস্তুর দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা পরিমাপ করা ইত্যাদি।

২) উড্ডয়ন উচ্চতা ( ): সাধারণভাবে গড় সমুদ্র জলতল থেকে বা কোনো কাল্পনিক তল ( ) থেকে উড্ডীয়মান বিমান পর্যন্ত উচ্চতাকে উড্ডয়ন উচ্চতা বলে।

৩) ডেটাম তল ( ) : সমুদ্র জলতল থেকে একটি জ্ঞাত উচ্চতার তল যা পারিপার্শ্বিক বস্তুর উচ্চতার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত হয় তাকে ডেটাম তল বলে।

৪) উন্মোচন স্টেশন ( ): উন্মোচিত হওয়ার সময় ক্যামেরার লেন্স মহাশূন্যের বা বায়ুমন্ডলের বা ভূমিভাগের যে বিন্দু অধিকার করে থাকে তাকে উন্মোচন স্টেশন বলে।

৫) উন্মোচন অন্তর ( ) : দুটি পরপর উন্মোচন স্টেশনের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধানকে উন্মোচন অন্তর বলে।

৬) উন্মোচন সময় ( ): যে সময় ক্যামেরার সাটার খুলে যায় এবং ফিল্মের মধ্যে বিকিরিত শক্তি আলোক তরঙ্গের আকারে প্রবেশ করে সেই সময়কে উন্মোচন সময় বলে।

৭) ওড়ান বেস ( ) : দুটি পরপর ক্যামেরা স্টেশনের মধ্যবর্তী দূরত্ব বা দুটি ক্যামেরা স্টেশন যোগকারী রেখা কে ওড়ান বেস বলে।

৮) টোন ( ): কালো থেকে সাদার মধ্যে প্রত্যেক স্বতন্ত্র শেড্ বা পার্থক্যকে টোন বলে। বিমানচিত্র ব্যাখ্যা বা পাঠের সময় টোন-এর পার্থক্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন বস্তুর সহাবস্থান চিহ্নিত করা হয়। ভূ-ভাগের কোনো বস্তু থেকে আলোর প্রতিফলনের পার্থক্যের কারনে এই টোনের পার্থক্য তৈরি হয়।

৯) নেগেটিভ ফিল্ম ( ) : ফিল্ম বা প্লেটের এক ধরনের ফোটোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবি যাতে বিপরীত ধরনের টোনের সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ হাল্কা টোন গাড় এবং গড় টোন হাল্কা হয়।

১০) পজিটিভ ফিল্ম ( ): যে ফোটোগ্রাফিক প্রতিচ্ছবিতে প্রকৃত টোন-ই দেখা যায় তাকে পজিটিভ ফিল্ম বলে।

১১) ফিডুসিয়াল চিহ্ন ( ): এগুলি একধরনের সূচক চিহ্ন। সাধারণভাবে ক্যামেরা লেন্সের সাথে ক্যামেরার সঙ্গে দৃড়ভাবে আটকানো থাকে এবং নেভেটিভ ও পজিটিভ ফিল্মে তার চিহ্ন থেকে যায়। বিমান চিত্রের চারপাশে পরস্পর বিপরীতে মোট চারটি ফিড্যুসিয়াল চিহ্ন থাকে।

১২) কেন্দ্রবিন্দু ( ): বিমানচিত্রের পরস্পর বিপরীতে অবস্থিত ফিড্যুসিয়াল চিহ্নকে যোগ করে যে রেখা পাওয়া যায় তাকে ফিড্যুসিয়াল অক্ষ বলে। এই ভাবে একটি বিমান চিত্রের পরস্পর আড়াআড়ি দুটি ফিড্যুসিয়াল অক্ষের সংযোগবিন্দুকে কেন্দুবিন্দু বলে। পাশাপাশি অনেকটি বিমানচিত্রের প্রত্যেকটির কেন্দুবিন্দু যোগ করে সংলগ্নকেন্দ্রবিন্দু ( ) পাওয়া যায়। কেন্দ্রবিন্দু ও সংলগ্নকেন্দুকে যোগ করে যে রেখা পাওয়া যায় তাকে ওড়ান রেখা বলে।

১৩) ওভারল্যাপ ( ): একটি ফোটোগ্রাফের যে অংশ অন্য ফোটোগ্রাফের মধ্যে থাকে তাকে ওভারল্যাপ বলে। একে শতাংশের আকারে প্রকাশ করা হয়। এই ওভারল্যাপ দু'ধরনের যথা- সম্মুখ ও পশ্চাৎ ওভারল্যাপ এবং পার্শ্ব ওভারল্যাপ। সম্মুখ ও পশ্চাৎ ওভারল্যাপ প্রায় ৬০ শতাংশ এবং পার্শ্ব ওভারল্যাপ প্রায় ২০ শতাংশ।

১৪) ফালি বা স্ট্রিপ ( ): নির্দিষ্ট উচ্চতার ওড়ান রেখা বরাবর যতগুলি ওভারল্যাপ যুক্ত ফোটোগ্রাফ তোলা হয় তার প্রত্যেকটিকে স্ট্রিপ বলে।

১৫) প্রামবব বিন্দু ( ): যদি কোনো বিমানের ফিল্মের মধ্যভাগের অঞ্চল থেকে কোনো প্রামবব বা ওলোন নিচের দিকে ফেলা হয় তবে সেটি যেখানে ভূমিকে স্পর্শ করে তাকে প্রামবব বিন্দু বলে।

১৬) প্যারালাক্স ( ): কোনো বস্তুকে বিভিন্ন কোণ থেকে দেখলে বস্তুর অবস্থানের যে পরিবর্তন চোখে পড়ে তাকে প্যারালাক্স বলে। বিমান চিত্রের ক্ষেত্রে বিমানের উর্ধ্বাকাশের অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য একটি বস্তুকে দু'ভাবে দুটি কোণ থেকে দেখা যায়। তার ফলে বিমান চিত্রে একধরনের প্যারালাক্স -এর সৃষ্টি হয়।

বিমানচিত্র ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত যন্ত্রাদি (Instruments used to interpret the Aerial Photo):

উল্লম্ব বিমানচিত্রের এক অন্যতম সমস্যা হলো যে এই চিত্র থেকে ভূমিরূপের আপাত পার্থক্য বোঝা যায় না। তাই নিখুঁতভাবে বিমান চিত্র পাঠের জন্য ম্যাগনিফাইং কাঁচ, লাইট বা আলোকযুক্ত টেবিল, স্টিরিওস্কোপ, স্টিরিওমিটার প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। এদের মধ্যে স্টিরিওস্কোপ বিমানচিত্রের ত্রিমাত্রিক দৃশ্য অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন হয়।

ম্যাগনিফাইং গ্লাস ( ) : এটি খুবই সাধারণ কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্র। একটি বিমান পাঠের জন্য এর ব্যবহার প্রয়োজন হয়। এর দ্বারা খালি চোখে যে সব ছোট ও সূক্ষ্ম ভূ-দৃশ্য বোঝা যায় না, তাদের সহজে নির্ধারণ করা যায় এবং ভূমিব্যবহার মানচিত্র প্রস্তুতে সাহায্য করে।

আলোকযুক্ত টেবিল ( ): এটি একধরনের আলো জ্বালাবার ব্যবস্থাযুক্ত সাধারণ টেবিল। যার সাহায্যে বিমান চিত্র বা উপগ্রহ চিত্রের বিস্তারিত পাঠ করা সম্ভব হয়।

স্টিরিওস্কোপ ( ): বিমান চিত্র পাঠের এটি হলো প্রধান যন্ত্র বিশেষ। এর দ্বারা চিত্রের ত্রিমাত্রিক ভূ-দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করা যায়। বিমান চিত্র বিভিন্ন ধরনের স্টিরিওস্কোপের ব্যবহার রয়েছে। সেগুলি হলো - পকেট স্টিরিওস্কোপ, মিরার স্টিরিওস্কোপ, ডাবল স্কেনিং স্টিরিওস্কোপ, জুম স্টিরিওস্কোপ প্রভৃতি। এদের মধ্যে পকেট ও মিরার স্টিরিওস্কোপের ব্যবহার-ই বেশি।

পকেট স্টিরিওস্কোপ - এটি অনেকটা চশমার মতো দেখতে। একে লেন্স স্টিরিওস্কোপও বলে। এতে দুটি ম্যাগনিফাইং লেন্স দুপাশের ধাতব ফ্রেমে লাগানো থাকে। এই স্টিরিওস্কোপকে সহজেই বহন করা যায়। প্রধান প্রধান ভূ-দৃশ্য পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে এই স্টিরিওস্কোপ ব্যবহার করা যায়। এর ফোকাল দৈর্ঘ্য ১০০ মিলিমিটার। এর থেকে রশ্মি সমান্তরালভাবে চোখে এসে পৌঁছায়।

মিরার স্টিরিওস্কোপ - অপেক্ষাকৃত উন্নত, বড় ও ভারী স্টিরিওস্কোপ হলো মিরার স্টিরিওস্কোপ। এতে দুপাশের ধাতব ফ্রেমে দুটি বড় আয়নার মতো ম্যাগনিফাইং কাঁচ লাগানো থাকে। প্রমান মাপের বিমান চিত্র (২৩ মিমি. X২৩ মিমি.) পাঠ করা যায়। পাশাপাশি দুটি ওভারল্যাপিং বিমানচিত্র পাঠের জন্য এই ধরনের স্টিরিওস্কোপ ব্যবহার করা হয়। কারন এর দ্বারা ওভারল্যাপিং অংশকে ফিউজ করা যায়। এর ফোকাল লেন্থ ৩০০ মিমি. হয়ে থাকে এবং চোখ থেকে বিমানচিত্রের দুরত্ব ৬৫ মিমি. থেকে ২৪০ মিমি. অর্থাৎ নিখুঁত ভাবে পাঠের জন্য দূরত্ব কমানো-বাড়ানো যায়।

ডাবল স্কেনিং স্টিরিওস্কোপ - এক সাথে দুটো বিমান চিত্র আলাদাভাবে পাঠের জন্য এই উন্নতমানের স্টিরিওস্কোপ ব্যবহার করা হয়। এর দ্বারা উল্লম্ব ও অনুভূমিক উভয়দিকেই বিমানচিত্রের স্কেন করা সম্ভব হয়।

জুম স্টিরিওস্কোপ - দুটি বিমানচিত্র নেগেটিভ অবস্থায় থাকার সময় পাঠের জন্য এই ধরনের স্টিরিওস্কোপ ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী বিমানচিত্র ছোট বা বড় করা যায় সহজেই। যন্ত্রের দুপাশে দুটি বাইনোকুলার থাকে যার দ্বারা এই বড়-ছোট করা সম্ভব হয়।

বিমানচিত্র পাঠের সূত্রাবলী ( ):

দূরসংবেদন ও জি.আই.এস. এর ব্যবহার ও গুরুত্ব

(Use and importance of Remote Sensing and GIS)

ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা

(Geographical Information System)

গত কয়েক দশকে দ্রুত ও শক্তিশালী কম্পিউটার বা গণকযন্ত্র আবির্ভাবে ফলে বিভিন্ন উদ্ভাবনী ক্ষমতা সম্পন্ন সফটওয়্যার আবিষ্কৃত হয়, যার দ্বারা বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিসংখ্যান ( ) গচ্ছিত বা সংরক্ষন করা ( ), বর্ণনা করা ( ), জনসমক্ষে পরিবেশন ( ) করা প্রভৃতি সম্ভব হয়। এই সব সফটওয়্যারের মধ্যে বেশির ভাগই ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা সম্পর্কিত। এই ব্যবস্থা ১৯৬০ দশকের মধ্যভাগ থেকে ১৯৭০ দশকের মধ্যে যথার্থ গতি পায়। কিন্তু ১৯৬৪ সালে সর্বপ্রথম কানাডার সরকারী সংস্থা কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করে। ১৯৮০ দশকের পর থেকে এই ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। বিভিন্ন সংস্থা এই ব্যবস্থা সম্পর্কিত সফটওয়্যারের বিকাশ ঘটায়। তাদের মধ্যে Arc Info, Arc View, Map Info, SPANS GIS, PAMAP GIS, INTERGRAPH, Geomatica, GRASS প্রভৃতি অন্যতম। ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থার মূলকথা বক্তব্য হলো "পৃথিবীর প্রত্যেকটি বস্তুই জিও রেফারেন্সড হতে পারে" ("Every object present on the Earth can be geo-referenced")।

ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থার সংজ্ঞা : ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা ভৌগোলিক ছাড়াও পরিকল্পনাবিদ, ভূ-তত্ত্ববিদ, ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পবিদ, মিলিটারি প্রমুখরা ব্যবহার করে থাকেন। তাই এই ব্যবস্থার এক নির্দিষ্ট সংজ্ঞা সহজ নয়। ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা বলতে সাধারণভাবে ভৌগোলিক স্থানাঙ্কের মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পদ্ধতির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও ফলাফল উপস্থাপনের কার্যপদ্ধতিকে বোঝায়। ১৯৮৬ সালে বোরো ( ) সংজ্ঞা প্রদান করেন যে, বাস্তব জগৎ থেকে বিশেষ কয়েকটি উদ্দেশ্যে দৈশিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ইচ্ছেমতন দেখা, পরিবর্তন করা, উপস্থাপন করা প্রভৃতির জন্য এক ব্যবহৃত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এক সেট্ যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা বলে ( )। আরনফ ( ) ১৯৮৯ সালে ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করেন, তাঁর মতে " জিও-রেফারেন্সড পরিসংখ্যান সমূহকে চারটি বিশেষ উদ্দেশ্যে নাড়াচাড়া বা আয়ত্ব করার জন্য কম্পিউটার নির্ভর ব্যবস্থাকে ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা বলে। এই চারটি উদ্দেশ্য হলো - পরিসংখ্যান ইনপুট, পরিসংখ্যান ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ সংরক্ষণ ও ইচ্ছেমতন ব্যবহার, বর্ণনা ও পরিসংখ্যান আউট পুট (মানচিত্র, রেখাচিত্র, ছক ইত্যাদি)।

ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থার উপাদান

ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থার উপাদান সমূহকে পাঁচটি শিরোনামে চিহ্নিত করা যায়। যথা - হার্ডওয়্যার (Hard-ware), সফটওয়্যার (Software), পরিসংখ্যান (Data), জনসাধারণ (People) ও পদ্ধতি (Method)।

হার্ডওয়্যার হলো কম্পিউটার প্রসেসিং ইউনিট, মনিটার, কি-বোর্ড, মাউজ, স্কেনার প্রভৃতি সমেত এক বিশেষ ব্যবস্থা যার সাহায্যে জি.আই.এস সফটওয়্যার কাজ করতে পারে।

Arc Info, Arc View, Map Info, SPANS GIS, PAMAP GIS, INTERGRAPH, Geomatica, GRASS প্রভৃতি হলো জি.আই.এস সফটওয়্যার, যাদের সাহায্যে পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, মানচিত্র প্রস্তুত প্রভৃতি করা যায়।

জি.আই.এস-র মূল কার্যকারিতা বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিসংখ্যানের ব্যবস্থাপনা করা। এই ব্যবস্থায় এক ডেটা বেস তৈরি করা হয়। সংগৃহীত তথ্যের বিশেষভাবে সংগঠন করে রাখা যা সহজেই কম্পিউটার প্রোগ্রাম চিহ্নিত করতে পারে তাকে ডেটা বেস বলে। একে সংক্ষেপে ডি.বি.এম.এস (Database management systems— D.B.M.S) বলে।